বহুত্ববাদী প্রেক্ষাপটে শহীদ মিনার

ড. শেখ আলীমুজ্জামান (জাপান)

স্বাধীনতার বীজ বপিত হয়েছিলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে, বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনে। ভাষা মায়ের দুই পাশে দন্ডায়মান শহীদ সন্তানদের প্রতীক হিসাবে, ঢাকার কেন্দ্রস্থলে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছিলো।কালক্রমে শহীদ মিনার হয়ে ওঠে আমাদের জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক।প্রতিটি জেলায় এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শহীদ মিনার নির্মিত হতে থাকে। সেই প্রেক্ষিতে ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটির নাম হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং অন্যগুলির নামকরণ নির্মাণের স্থান অনুযায়ী হতে থাকে। একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর আআত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায়, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও শহীদ মিনার নির্মিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যের প্রবাসীরা নিজ উদ্যোগে কাজটি শুরু করলে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বিদেশের মাটিতে প্রথম শহীদ মিনারটি নির্মিত হয় জাপানের রাজধানী টোকিওতে। টোকিও শহীদ মিনার নির্মাণের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আছে। অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি, সংগঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০০০ সাল থেকে টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে বৈশাখী মেলার আয়োজন শুরু করে।পরের বছর, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার কারণে বাংলাদেশ সহ মুসলিম প্রধান দেশগুলো বিশ্বব্যাপী যে ইমেজ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলো, তা জাপানেও অনুভুত হয়।বৈশাখী মেলার আয়োজক সংগঠন তখন ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পৃক্ত সেই সংকট সাংস্কৃতিক ভাবে মোকাবিলা করার কর্মসূচি হিসাবে মেলার সাথে বাংলাদেশী প্রবাসীদের সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত করে। বাংলা, জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় বৈশাখী মেলার স্মরণিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশকে ধর্মীয়ভাবে সহনশীল ও সংস্কৃতিপ্রাণ রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরা হয়। ধীরে ধীরে মেলাটি হয়ে ওঠে বাংলাদেশ-জাপান সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সর্ববৃহত উৎসব।

জাপানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইমেজকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে, ২০০৫ সালের বৈশাখী মেলায় পার্ক কর্তৃপক্ষের কাছে শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করা হয় । জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির জাপানি সদস্যরাও নিজেদের দাবী বলে প্রস্তাবটির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এই খবর প্রচারিত হলে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিতে আগ্রহী ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে টোকিও বৈশাখী মেলা প্রাংগনে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাব প্রদান করে।তবে জাপানি কর্তৃপক্ষ টোকিও শহরের মাঝখানে অন্য একটি দেশের ভাষা শহীদদের স্মারক মিনার স্থাপনে সম্মত হয় নি।তাদের বোঝানো হয় যে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে শহীদ মিনারের প্রতীকি অর্থেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে, পৃথিবীর সব মাতৃভাষাই মায়ের সাথে দন্ডায়মান সন্তানের প্রতীক। অত:পর ২০০৫ সালের ১২ই জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাপানে রাষ্ট্রীয় সফরকালে, টোকিওর সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে সুবিদিত ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।পরবর্তী বছরের ১৬ই জুলাই অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলায় শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করা হয়। জাপানি ও অন্যান্য বিদেশীদের বোঝার জন্য শহীদ মিনারের পাশে একটি পরিচিতি ফলক স্থাপন করে এটির পরিচয়, প্রেক্ষাপট ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাম, বাংলা, জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় বর্ণনা করা হয়।

টোকিও শহীদ মিনার নির্মাণের পরবর্তী বছরগুলিতেও ইকেবুকরো নিশিগুচি পার্কে নিয়মিত বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতীক হিসাবে স্থাপিত

বহুত্ববাদী প্রেক্ষাপটে শহীদ মিনার

ড. শেখ আলীমুজ্জামান (জাপান)

টোকিও শহীদ মিনারকে জাপানিদের কাছে পরিচিত করার লক্ষ্যে, জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি ২০০৯ সাল থেকে মেলার পার্কে একুশের প্রভাত ফেরি শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু করে।জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, টোকিও মহানগর কর্তৃপক্ষ ও ইউনেস্কো ফেডারেশ জাপান এর দাপ্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত একুশের অনুষ্ঠান মালায়, এশিয়ার নানা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা ছবি প্রদর্শনি, বাংলা ও জাপানি সঙ্গীত পরিবেশনা, জাপানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আদিবাসী আইনুদের সঙ্গীত পরিবেশনা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে জাপানের একটি জাতীয় দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেবার আহবান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।খোলা চত্তরে আগতরা যাতে প্রচন্ড শীতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন, সে জন্য বিশেষ বিবেচনায় পিঠা ও চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।অনুষ্ঠানটি নিয়ে জাপানের জাতীয় সংবাদপত্রগুলি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তবে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি অংশ এই পিঠা-চা এর আয়োজনকে তথাকথিত পিঠা উৎসবের অপব্যাখা দিয়ে বিরোধিতা করার কারণে আয়োজক সংগঠন ২০১১ সাল থেকে অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়। এতে অংশগ্রহণকারি অনেকেই হতাশ হয়, কেউ কেউ বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের বিপরীতে সাংস্কৃতিক মৌলবাদের উত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আশংকা প্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক মৌলবাদ হল এমন একটি মতাদর্শ যা কোনও সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের মৌলিক উপাদানগুলিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, সেগুলির প্রতি কঠোর আনুগত্য দাবি করে এবং ভিন্ন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক চর্চাগুলির বিরোধিতা করে।সাংস্কৃতিক মৌলবাদের একটি উদাহরণ জাতিগত বা ভাষাগত জাতীয়তাবাদ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও ভাষাকে অন্য জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। ইউনেস্কো প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড কালচার রিপোর্ট ২০০০ এ উল্লেখ করা হয়, ইউরোপের কিছু রাজনৈতিক দল সাংস্কৃতিক মৌলবাদ উস্কে দিয়ে সামাজিক বিভেদও সংঘর্ষের সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের বিগত সরকার বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিহত করার যে বয়ান তৈরী করেছিলো, সেটা একধরণের সাংস্কৃতিক মৌলবাদ ছিলো কি না ভেবে দেখার বিষয়। বেসুরো গলায় রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার কারণে থানায় ধরে নিয়ে, 'আর গাইব না', মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিলো।একুশে ফেব্রুয়ারিতে কারা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে যায় না, সে হিসাব করা হয়েছিলো।

টোকিও শহীদ মিনারের প্রসংগ শেষ করি।২০১৯ সালে ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কের সংস্কার কাজ শুরু হলে, এক বছরের জন্য পার্কটি বন্ধ করে শহীদ মিনার অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।২০২০ সালে নিশিগুচি পার্কটি গ্লোবাল রিং বহিরঙ্গন থিয়েটার হিসাবে নতুন সাজে উন্মুক্ত করা হয়।অবাক ব্যাপার ছিলো, থিয়েটার স্টেজের পাশে শহীদ মিনারের জন্য জায়গা রাখা হলেও সেটা ফিরিয়ে আনা হয় নি।জানা যায়, যেহেতু এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া তাই তৎকালীন রাষ্ট্রদূত শহীদ মিনারটি প্রাংগনে ফিরিয়ে আনতে বাধা দিয়েছেন।সম্ভবত এই অপকুটনীতির পুরষ্কার হিসাবে সেই রাষ্ট্রদূত শীঘ্রই জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তথাপি আপামর প্রবাসী ও জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির ক্রমাগত আবেদনের ফলে, ২০২১ সালে গ্লোবাল রিং প্রাংগনে শহীদ মিনার ফিরিয়ে আনা হলেও সেটির পরিচিতি ফলকটি ফেরানো হয়নি। ২০২৪ সালের বৈশাখী মেলায়, মঞ্চে উপবিষ্ট জাপানি কর্তৃপক্ষের (সিটি মেয়র) উপস্থিতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে পরিচিতি ফলকটি ফিরিয়ে আনার জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলাম কারণ বিদেশের মাটিতে পরিচয়হীন শহীদ মিনার জাতি হিসাবে আমাদের জন্য অবমাননাকার, কিন্তু তিনি সাড়া দেন নি। ক্রমাগত চাপের মুখে

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে দূতাবাসের কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, এক ব্যক্তির অপছন্দের কারণে আগের ফলকটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, নতুন করে ফলক নির্মাণ করাও সম্ভব নয়।তার মানে, বিগত সরকারের আমলে ধর্মীয় মৌলবাদ ঠেকাতে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার রাজনৈতিক বয়ানের চেয়েও এক ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দই মুখ্য ছিলো! অবশেষে ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর নবাগত রাষ্ট্রদূত পরিচিতি ফলকটি ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেন এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং টোকিও বৈশাখী মেলার আয়োজক সংগঠন, 'জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি'র অর্থায়নে ২০২৫ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী হুবহু আগের ফলকটি পুনর্নির্মাণ করে শহীদ মিনারের পাশে স্থাপন করা হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: পরিচিতি ফলকটি পুনর্নির্মাণ করে শহীদ মিনারের পাশে স্থাপনের কাজ চলছে

এবারে মূল প্রসঙ্গ, বহুত্ববাদী অবস্থান থেকে শহীদ মিনারে আসি।জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধমনিরপেক্ষতা' পরিবর্তন করে 'সাম্য, মানবিক মযাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ' রাখার সুপারিশ করেছে। সম্ভবত বহুত্ববাদের প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি' উল্লেখ করে যে বিধানটি রাখা হয়েছে, সেটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে। জানতে চাই, আদিকাল থেকে এই অঞ্চলের নাম যেহেতু বাংলা তাই জাতি হিসাবে বাঙালি শব্দটা কেন রাখা যাবে না, রাষ্ট্রধর্ম ইসালাম তো বাদ দেয়া হয় নি। বহুত্ববাদের উদ্দেশ্য যেহেতু বহু অংশীজনদের সংযুক্ত করা কাউকে বিযুক্ত করা নয়, তাই

বহুত্ববাদী প্রেক্ষাপটে শহীদ মিনার

ড. শেখ আলীমুজ্জামান (জাপান)

‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত’ এভাবে বর্ণনা করে শব্দটা রেখে দেওয়া যায়।সংবিধানে বাঙালি শব্দটি রেখে দেওয়া অপরিহার্য, কারণ যে পাটাতনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি, তার নাম বাঙালির ভাষা আন্দোলন। এবং ভাষা আন্দোলনের প্রতীক শহীদ মিনার বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। শুধু মাত্র একুশে ফেব্রুয়ারী নয়, যে কোন দিনে, যে কোন সংকটে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার ঠিকানা শহীদ মিনার। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের চুড়ান্ত বিজয়যাত্রা শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়েছিলো, এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলো।এই প্রবাস জীবনেও শহীদ মিনার প্রাংগনে একত্রিত হয়ে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করে থাকি।

শহীদ মিনার ভিত্তিক ঐক্য সংহত করার লক্ষ্যে একুশ উদযাপনে বহুত্ববাদ প্রতিফলিত হওয়া দরকার। যুগপৎ ভাষা শহীদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলেও, পালনের ক্ষেত্রে কালো ব্যাজ পরে, খালি পায়ে, ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো’ গান গেয়ে, মিনারের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করে কেবলমাত্র ভাষা শহীদ দিবস পালন করা হচ্ছে। শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করার জন্য কোন পালন নেই, অনুষ্ঠানসূচী নেই। ভাষা শহীদ দিবসের শোকের আবহের বাইরে কিছু করার চেষ্টা করলেই কট্টর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।এভাবে একুশের সাথে সার্বজনীন, সার্বজাতিক একাত্মতা হতে পারে না।পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, এটা বহুত্ববাদের সাথে মেলে না। বরং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ভাষায় শহীদ মিনার প্রাংগনে প্রাণ খুলে গান গাইতে পারলে দিবসটিকে তাদের নিজস্ব মনে হতো। একই ভাবে, যে সব ধর্মভীরু ছেলেমেয়েরা বিদাআত মনে করে শহীদ মিনার এড়িয়ে চলে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শহীদ মিনার প্রাংগনে তাদের হামদ-নাত ও গজল পরিবেশন করার সুযোগ দিলে তারাও একাত্মতা বোধ করবে।বাঙালি সকালে ফজরের নামাজ পড়ে সন্ধ্যায় গানের জলসায় যায় তো!।বরং সকালে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করে সন্ধ্যায় শহীদ মিনার প্রাংগনে কনসার্ট কিংবা জলসার আয়োজন করলে তা বহুত্ববাদ সম্মত হবে ।

শুরুটা বাঙালিরা করেছিলো, এবার অন্যদের যে যার মতো করে সংযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হোক। মতপার্থক্য কিংবা দৃষ্টিভংগীর ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন জাতীয় ঐক্যের যে প্রত্যাশা, একমাত্র শহীদ মিনার প্রাংগনেই তা অর্জন করা সম্ভব। অতীতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি শহীদ মিনারই হোক আমাদের আগামীর সার্বজনীন ঐক্যের পাটাতন।

(প্রথম প্রকাশ: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫, জাপানবাংলাদেশ ডট কম)

Email: sheikhaleemuzzaman@gmail.com
Web: sheikhaleemuzzaman.com